'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' ক্ষুদ্র নাটক দুটিকে একত্র করে রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেছেন 'কালের যাত্রা' (ভাদ্র, ১৩৩৯)। এই নামকরণে যে ভাবসত্যের ইঙ্গিত আছে সে সম্পর্কে 'রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা' গ্রন্থে শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন–

> 'এই নিরবচ্ছিন্ন কালের যাত্রার কতো ধ্বংস, কতো নূতন সৃষ্টি, কতো উত্থান-পতন, কতো নব নব রূপের উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে। এই পুরাতনের বিলয় ও নূতনের আবির্ভাবের মূলে নিহিত আছে একটা কারণ। যখনই একপ্রকার ব্যবস্থার মধ্যে অসত্য, অন্যায় ও কৃত্রিমতা প্রবেশ করে, তখনই চিরন্তন ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে, স্রোতোধারায় বিক্ষোভ উপস্থিত হয়; তারপর প্রাচীনের পরিবর্তনের পর নবীন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। কালের যাত্রাপথে যতো দ্বন্দ-সংঘাত, সমস্তই পারিপার্শ্বিকের অসামঞ্জস্যের জন্য, মানুষের স্বার্থ-কামনায় ও অসত্য ব্যবহারের জন্য; উহা দূর হইলেই কালের যাত্রা নবতর পথে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে। মহাকাল তাই যাত্রাপথে ধ্বংস ও নবসৃষ্টির মধ্য দিয়া সমস্ত অসামঞ্জস্য দূর করিয়া, সমস্ত অশোভনতা মুছিয়া দিয়া ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। সমস্ত অচলতা ও বিক্ষোভের মূল এবং ধ্বংসের কারণ এই সামঞ্জস্যের অভাব- এই ভারসাম্যের বিপর্যয়'।[১]

সৃষ্টি আর ধ্বংস সব মিলিয়েই মহাকালের লীলা। আসক্তিশূন্য স্বার্থ-দ্বন্দের অতীত হয়ে তা চলে। সৃষ্টি না থাকলে ধ্বংস হয়না আবার ধ্বংস না হলে সৃষ্টি সম্ভব নয়। শিব একদিকে শ্মশানেশ্বর, ধ্বংসের দেবতা, সর্বরিক্ত, অকিঞ্চন। আবার তিনিই নবনব ঐশ্বর্যের জন্মদাতা। ত্যাগী না হলে ভোগী হওয়া যায় না। আবার ভোগী না হলে ত্যাগী হওয়াও অনর্থক। এই দুই ভাবসত্যের সামঞ্জস্য বিধানের নাম মহাকালের যাত্রা। এই দুই রূপক নাট্য সেই দার্শনিক উপলব্ধিরই প্রকাশ। 'রথের রশি'র পূর্বরূপ 'রথযাত্রা' ১৩৩০ অগ্রহায়ণ, 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত। 'রথযাত্রা' গদ্যে লেখা আর 'রথের রশি' গদ্যছন্দে লেখা। 'রথযাত্রা'য় কবির দৃষ্টি রথের উপরে আর 'রথের রশি'তে

যে টানের জোরে রথ চলে তার উপরে। 'রথের রশি'র পরিশিষ্ট অংশের নাম 'কবির দীক্ষা'। 'কবির দীক্ষা' নাটক কিনা বলা যায় না। সেখানে কথোপকথনরত দুই ব্যক্তির একজন কবি আর একজন পূর্বে কবির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, বর্তমানে বিজ্ঞজনের তাড়ায় কবিকে পরিত্যাগ করে প্রলয় সাধনায় শিবমন্ত্র দানকারী তত্ত্বানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষিত। যদিও-

"কালিদাস ছিলেন শৈব।/ সেই পথের পথিক কবিরা।"[২]

অর্থাৎ কবিরাও শিবমন্ত্র দান করতে পারেন। তত্ত্বানন্দ স্বামীর সঙ্গে কবিদের প্রধান পার্থক্য হলো- তত্ত্বানন্দ স্বামী সরাসরি ত্যাগের মন্ত্র দান করেন কিন্তু কবিরা দেন জীবনকে গ্রহণের মন্ত্র। তবে তা কেবল ভোগের জন্য নয় বরং ভোগের অতিরিক্ত ত্যাগের আনন্দ লাভের জন্য জীবনকে গ্রহণ। সুতরাং সঞ্চয়ও ত্যাগের আনন্দ লাভের জন্য। শিব একদিকে ত্যাগী আবার অন্যদিকে অন্নপূর্ণেশ্বর রূপে প্রার্থী। এই অন্নপূর্ণা আসলে সব মানুষ। তাদের কাছে শিব প্রার্থী। তবে সেই মানুষদের সঞ্চয় যদি শূন্য হয় বা দান করতে না শেখার কারণে তাদের সঞ্চয় যদি ঐশ্বর্যের ভার হয় তবে তা ব্যক্তিকে কেবল অতলে ডুবিয়ে দেবে।

আমরা ভারতীয়রা শ্মশান শিবের রিক্ত-ত্যাগী মূর্তিতে মুগ্ধ হয়ে জীবনকে গ্রহণ করতে ভুলেছি। পাশাপাশি য়ুরোপ খন্ডকে বলা যায় শিবের চেলা। কারণ তারা মহাভিক্ষুর দাবি মেনেছে। তাই নিজেদের ধনে-মানে-জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে শিখেছে। তারা যদি সঞ্চয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে ত্যাগকে বর্জন করে তবে একদিন নিজেরাও রিক্ত হবে। ভারত শিবের রিক্ত-ত্যাগী মূর্তির উপাসক বলে জীবনকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ। শিবের অভাবও যেমন ঘুচাতে পারেনি তেমনি নিজেকেও পূর্ণ করে তুলতে শেখেনি। য়ুরোপ শিবের অন্নপূর্ণেশ্বর মূর্তির উপাসক হয়ে সঞ্চয় শিখেছে, জীবনকে গ্রহণ করতে শিখেছে। তবে এর পাশাপাশি যদি ত্যাগকে আয়ত্ত করতে না শেখে তবে তারাও লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সঞ্চয়ের ভারে নিচের দিকে নামবে। ভারত ও য়ুরোপ খন্ডকে ত্যাগের দ্বারা ভোগের দীক্ষা দান করার শিক্ষা 'কবির দীক্ষা' নাটিকার মূল কথা- 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা :'। ত্যাগ আর ভোগের সামঞ্জস্য বিধানই শক্তির পূর্ণরূপের জন্ম দেয়।

> "ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনও স্বর্গরাজ্য অসহায় আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনে ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপদ্রব প্রবল। প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।...এইজন্যেই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করিবার জন্য নয়, নিজেকে পূর্ণ করিবার জন্যই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ শিবের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে

ত্যাগ আনন্দের জন্য। এইজন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা :', ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে আসক্তির দ্বারা নয়।"[৩]

এটাই 'কবির দীক্ষা'র মূল কথা। 'রথের রশি' তত্ত্বনাট্যে রথের রশি আসলে মানব সম্বন্ধের প্রতীক। এই সম্বন্ধ অটুট না হলে বা তাতে অসত্যের অনুপ্রবেশ ঘটলে মহাকালের রথ বিকল হয়ে পড়ে। রথযাত্রার মেলায় কাকভোরের আগেই স্নান সেরে শুচিশুভ্র হয়ে মেয়েরা মেলায় এসেছে। দোকানিরা পসার সাজিয়ে চুপচাপ বসে আছে কিন্তু রথের দেখা নেই, চাকার শব্দ নেই। ব্রাহ্মণ ঠাকুর তার শিষ্যগণ নিয়ে বেরোবেন, সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেরোবেন রাজা আর পুঁথিপত্র হাতে ছাত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবেন পন্ডিতমশাই। রথযাত্রার এই পুণ্যলগ্নে রথের অদর্শন মানব সভ্যতার জন্য নিয়ে আসবে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ। দিকে দিকে বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী আর ধরণী হবে বন্ধ্যা, অজন্মা। লক্ষ্মীর ভান্ড হবে শতছিদ্র, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান। হীন স্বার্থপরতার জাঁতাকলে বন্দী মানুষ ছিন্ন করেছে মানব-সম্বন্ধের সকল বন্ধন। ঋণের উপরে ঋণ করে দেউলে করে দিয়েছে যুগের বিত্ত। তাই মহাকালের রথ আজ অচল। অনড়, অসাড় দড়িটাকে কখনও মনে হচ্ছে অজগর, কখনো মনে হচ্ছে এখনি ফণা তুলে মারবে ছোবল। আবার কখনো মনে হচ্ছে যুগান্তরের নাড়ী, আজ সান্নিপাতিক জ্বরে করছে দব্ দব্। কখনো হয়ে যাচ্ছে কালো তো কখনো নীল। একদিন কালের প্রথম বাহন হয়ে পুরুতের মন্ত্রপড়া হাতের টানে রথ চালাতো পুরুত ঠাকুর। যুগযুগ ধরে তার অহংকার আর জাত্যভিমানে আজ মন্ত্রশক্তি হয়েছে দুর্বল। তার টানে রথ সামনে না এগিয়ে পিছনের পথে চলে। কেবল আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব পূজায় তাকে তুষ্ঠ করার চেষ্টা বৃথা। কারণ সে সাধনা মহাকালের কাছে পৌঁছাবে না। সংসারে পাপাত্মাদের ভীড় বাড়লেই কালেভদ্রে আসা দু-একজন পুণ্যাত্মারা দৌড় মারে জঙ্গলে, গুহায়। কালের পথ যখন দুর্গম হয় তখন কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও আবার গভীর গর্ত আরো গভীর হয়ে যায়। তখন সব সমান করে নিয়ে বিপদ ঘুচাতে হয়। নিচু মাথা হেঁট করে চিরদিন উঁচুর মান রেখে গেছে। মহাকাল আজ উঁচু নিচু সব খাত, সব ব্যবধান সমান করে সামঞ্জস্য এনে দিতে চাইছেন। নইলে দড়ি দেবতা বা রাস্তা দেবতার পুজো যতই করা হোক না কেন রথ একবিন্দু নড়বে না। পুরুতের মন্ত্রশক্তি ব্যর্থ হলে সৈন্যসামন্ত নিয়ে স্বয়ং রাজা নামেন রথ নাড়াতে। তার মদগর্বী সৈন্যরা ক্ষত্রিয়ের গর্বে আস্ফালন করে-

"ক্ষত্রিয় আমরা, শূদ্র নই, নই গোরু।
চিরদিন আমরা চড়েই এসেছি রথ'।
চিরদিন রথ টানে ঐ ওরা- যাদের নাম করতে নেই।"[৪]

এ যে মহাকালের নাথের অপমান। তিনি তাঁর বিচারে কোন ফাঁক রাখেন না। তাঁর অপমানেই ঘটে সকল অনাসৃষ্টি। এই বোধ নেই যাদের তারাই চড়ায় আস্ফালনের মাত্রা। রাজসৈন্যের আস্ফালনের সহযোগী হয়ে বর্ণবাদী নাগরিকেরা শোনায়-

"ত্রেতাযুগে শূদ্র নিতে গেল ব্রাহ্মণের মান-
চাইলে তপস্যা করতে, এত বড় আস্পর্ধা-
সেদিনও অকাল লাগল দেশে, অচল হল রথ।
দয়াময় রামচন্দ্রের হাতে কাটা গেল তার মাথা,
তবে তো হল আপদশান্তি।"[৫]

আলোচ্য অংশে রামচন্দ্র কর্তৃক শূদ্র শম্বুকের বধের প্রসঙ্গ স্মরণ করা হয়েছে। মনুর বিধানে শূদ্রের শাস্ত্র অধ্যয়ন, বেদ পাঠ নিষিদ্ধ। সশরীরে স্বর্গবাসের আশায় শম্বুক সে বিধান ভুলে কঠোর সাধনায় ব্রতী হয়। তাই নাকি দেশে অনাসৃষ্টি, ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যু। পুত্রহারা ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রের কাছে এসে পুত্র ভিক্ষা চান। নইলে রাজদ্বারে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ভীত রাম নারদের কাছে ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। নারদ শোনান-

"এই রাজ্যে নিশ্চয়ই কোন শূদ্র তপস্যায় রত আছে। এর প্রতিবিধানের জন্য রাম অনুসন্ধানে বহির্গত হয়ে তপস্যারত শূদ্র শম্বুককে দেখতে পেলেন এবং খড়্গাঘাতে তাঁর শিরচ্ছেদ করলেন। এর ফলে শূদ্র শম্বুকও স্বর্গে যান এবং মৃত ব্রাহ্মণকুমারও বেঁচে উঠল।"[৬]

সেইসাথে সৈনিকের আরো আশঙ্কা-

"আজ শূদ্র পড়ে শাস্ত্র,
কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ!"[৭]

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রচেষ্টায় যখন রথ চলে না তখন ডাক পড়ে বেনের। কারণ কলিযুগে শাস্ত্র অথবা শস্ত্র দুটোই ভোঁতা বরং চলে মাত্র স্বর্ণচক্র। তাই ডাকা হয় শেঠজিকে। আসলে কলিযুগে রাজতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থতন্ত্র। বেনেরা সেই তন্ত্রের চালক। শেষ পর্যন্ত এদের হাতেও রথ চললো না। উল্টে দড়ি ফুলে বীভৎস হয়ে মরা বাসুকির মতো হয়ে ওঠে। বেনের টানে সত্যি যদি রথ চলতো তবে তাও রাজতন্ত্রের কাছে অপমানকর হতো। জাত্যাভিমান থেকে তারা তাদের শতঘ্নীর বজ্রনাদকে স্মরণ করে। মোট কথা শেষ পর্যন্ত এদের কারোর প্রচেষ্টাতেই মহাকালের রথ চলেনি। বরং রশিটা আরো আড়ষ্ট হয়ে তাদের হাতে যেন পক্ষাঘাত তৈরী করে দেয়। ধনপতি শোনালেন-

"এবার উপায় বার করবেন স্বয়ং মহাকাল।
তাঁর নিজের ডাক যেখানে পৌঁছবে
সেখান থেকে বাহন আসবে ছুটে।
আজ যারা চোখে পড়ে না
কাল তারা দেখা দেবে সবচেয়ে বেশি।
ওহে খাতাঞ্চি, এই বেলা সামলাও গো খাতাপত্র-
কোষাধ্যক্ষ, সিন্ধুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।"[৮]

ইতিমধ্যে দড়িদেবতাকে নাড়াতে গ্রাম্য মেয়েদের নানা মেয়েলি সংস্কার পালনের সিদ্ধান্ত শোনা যায়। ওদিকে চরের মুখে মন্ত্রীমশাই শুনলেন- শূদ্রপাড়ায় শূদ্ররা গোল বাঁধিয়েছে রথ চালাবে বলে। যারা এতকাল তলোয়ারের নিচে শাসিত হয়ে এসেছে। আজ কিন্তু সেই তলোয়ার মারতে মারতে ক্ষয়ে যাবে। তবু তারা দৃঢ়বদ্ধ রথ চালাবে বলে। নাটকে মন্ত্রীমশাই একমাত্র চরিত্র যিনি মহাকালের মন্ত্রধ্বনি বুঝেছেন। তাঁর সাবধান বাণী-

"নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়,
বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।" [৯]

তিনি বুঝতে পারেন তলোয়ারের বেড়া তুলে বন্যা আটকানো যায় না। বাধা পেলে শক্তি নিজেকে চিনতে পারে আর তখন তাকে ঠেকানো দুষ্কর হয়। শূদ্র দলকে সঙ্গে নিয়ে তাদের দলপতি এলেন। এই শূদ্ররা এতদিন চলন্ত রথের চাকায় চ্যাপ্টা হয়ে ধুলোয় মিশে যেত। আজ তাদের কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর। তাদের জিজ্ঞাসা- সংসার কি কেবল পুরোহিত বা মন্ত্রী চালান? তারাই ধরে লাঙল, ফলায় ফসল। যে অন্নে বাঁচে মানুষ। মন্ত্রী অনুরোধ করলেন- বরাবর যে অভ্যস্ত রাস্তায় রথ চলেছে তারাও যেন সেই রাস্তা ধরে রথকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। মুহূর্তে শূদ্রের হাতের স্পর্শে দড়িতে এলো প্রাণ। পুরোহিতের ঔদ্ধত্য, ক্ষত্রিয়ের হুঙ্কার ও চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে মহাকালের অদৃশ্য ইশারায় তারা রশিতে হাত দেয়। মন্ত্রীমশাই স্বীকার করে নিলেন-

"ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।
স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন।
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে।"[১০]

কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত। রথ তো চলছে। তবে তা অভ্যস্ত রাজপথে না চলে জনপদের দিকে ছুটলো। -

"পুরোহিত ভাবিল, তাহাদের মন্দিরের দিকে চলিয়াছে, সৈনিক ভাবিল, তাহাদের অস্ত্রাগারের দিকে ছুটিয়াছে, ধনিক ভাবিল, তাহাদের ধনভান্ডারের দিকে ছুটিয়াছে, সকলেই ভাবিল, তাহাদের সব চাপা পড়িল। তাহারা নিজ

নিজ আবাসের মুখে ছুটিল। মেলায় বিস্মিত নরনারী শুধাইল, এ কি রকম? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য কবি আসিয়া উপস্থিত হইল'।"[১১]

পুরুত বা রাজার হাতে রথ না চলার কারণ ব্যাখ্যার্থে কবি শোনালেন- ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু, মহকালের রথের চূড়ার দিকেই ওদের দৃষ্টি ছিল। নীচের দিকে ওদের চোখ নামেনি। দড়িকে মনে করেছিল অতি তুচ্ছ। মানষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানেনি। রাগী বাঁধন তাই আজ উন্মত্ত হয়ে লেজ আছড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে শূদ্র প্রসঙ্গে কবির সাবধান বাণী-

"একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে-
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন ওরাই হবেন বলরামর চেলা-
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে'।"[১২]

তখন আবার নতুন লোকের ডাক পড়বে মহাকালের কণ্ঠ থেকে। বারেবারে কবির ডাক পড়েছে সেই টানে। কিন্তু কাজের লোকের ভীড় ঠেলে তাঁরা পৌঁছাতে পারেনি সেখানে। সেই রথ চালানোর দিন যেদিন আসবে তখন কবিই চালাবেন রথ। কবি কঠোরকে জানে না, জানে সুন্দরকে, সত্যকে। গায়ের জোরে নয় ছন্দের জোরে তারা চালাবেন রথ। অসুন্দর সেখানে পাবেনা ঠাঁই। বাইরের ঠেলামারার উপরে বিশ্বাস যাদের তাদের হাত থেকে রথ চালানোর দায়িত্ব সরে গিয়ে অন্তরের তালমানের উপর যাদের ভরসা অর্থাৎ সেই কবির হাতেই চলবে মহাকালের রথ। যুগাবসান হলেই আগুন লাগে আর সৃষ্টি হয় নবযুগের। আজ শূদ্রদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন। নইলে যে ছন্দ মেলে না। একদিকটা এত উঁচু হয়েছিল যে ঠাকুরকে দাঁড়াতে হয়েছিল ছোটোর দিকে। বড়োটাকে কাত করে সমান করতে হয়েছিল তঁর আসনটা। এরপর অন্য কোনো যুগে আবার উল্টোরথের পালা আসবে। তখন আবার উঁচুতে নিচুতে বোঝাপড়া হবে। আজকের মতো সবাই অন্তত একবার বলা যাক- "যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে"[১৩]। 'কবির দীক্ষা' প্রথমে মুদ্রণ হয় 'শিবের ভিক্ষা' নামে, ১৩৩৫ বৈশাখ 'মাসিক বসুমতী' পত্রে। 'শিবের ভিক্ষা'য় শিবকে করে তোলা হয়েছে বড় আর 'কবির দীক্ষা'য় শিবভক্ত কবিকে তোলা হয়েছে বড় করে।

'....গাছের ফল ত্যাগ দিয়ে।
ফল ফলে না রস না হলে।
প্রাণের ধনই হল আনন্দ, যাকে বলি রস।
যেখানে রসের দৈন্য, ভরে না সেখানে প্রাণের কমন্ডুল'।[১৪]